بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩ মোতাবেক ২২ ফাতাহ্, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজকাল খুতবাতে উহুদের যুদ্ধের আলোচনা চলছে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মুসলমানরা গণযুদ্ধে কাফেরদের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করে। তারা পলায়ন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর তাকিদপূর্ণ নির্দেশনা সত্ত্বেও গিরিপথের সুরক্ষায় নিয়োজিত অধিকাংশ লোক যখন গিরিপথ ছেড়ে দেয় তখন শত্রুরা সেদিক দিয়ে আক্রমণ করে আর মুসলমানদের চরম ক্ষতিসাধন করে। এর বিস্তারিত বর্ণনা কিছুটা এরূপ যে, মুশরিকদের পতাকাবাহকরা যখন একে একে নিহত হয় এবং অন্য কেউ পতাকা উঠানো কিংবা এর কাছে আসার সাহস দেখাতে পারে নি তখন হঠাৎ মুশরিকরা পিছু হটতে আরম্ভ করে আর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। তাদের নারীরাও, যারা কিছুক্ষণ পূর্বেও পুলকিত কণ্ঠে ও পূর্ণ উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার সাথে ঢাক বাজিয়ে গান গাইছিল, তারা ঢাক ফেলে বাহিরের দিকে ছোটে। মুসলমানরা শত্রুদের পালাতে দেখে তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের অস্ত্র সংগ্রহ করতে এবং গনিমতের সম্পদ একত্রিত করতে থাকে। তখনই মুসলামানদের সেই তিরন্দাজ দল, যেটিকে মহানবী (সা.) পাহাড়ের ওপর মোতায়েন করে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন কোনো অবস্থাতেই নিজ স্থান পরিত্যাগ না করে, সেখান থেকে গনিমতের সম্পদ একত্রিত করার জন্য ছোটে– এটি বলা হয়ে থাকে। মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই দলের প্রধান হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের তাদেরকে কঠোরভাবে বারণ করেন যে, তাদের কোনো অবস্থাতেই এখান থেকে যাওয়ার অনুমতি নেই। কিন্তু তারা মানে নি এবং বলে, মুশরিকরা পরাজয় বরণ করেছে। এখন আমরা এখানে থেকে কী করব? একথা বলে তারা পাহাড় থেকে নেমে আসে আর গনিমতের সম্পদ একত্রিত করতে থাকে। তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ নিজ স্থান পরিত্যাগ করলেও তাদের প্রধান হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের এবং আরও কতিপয় সাহাবী নিজ স্থানে অনড় থাকেন যাদের সংখ্যা দশজনেরও কম হবে। তিনি গিরিপথ থেকে নীচে অবতরণকারীদের বলেন, আমি কিছুতেই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করব না। অর্থাৎ তাদের দলনেতা এই কথা বলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও জীবনীকার গিরিপথ পরিত্যাগকারী সাহাবীদের উল্লেখ করতে গিয়ে এটিই বর্ণনা করেন যে, তাদের গনিমতের সম্পদ হস্তগত করার তাড়া ছিল। তাই তারা জোর দিচ্ছিল যে, বাকি সবাই যখন গনিমতের সম্পদ জমা করছে তখন আমরা কেন পিছিয়ে থাকব? অথচ তাদের প্রধান হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের তাদেরকে নিষেধ করে বলেন, আমাদেরকে মহানবী (সা.) এই নির্দেশই দিয়েছিলেন যে, যা-ই হোক না কেন– তোমরা নিজেদের এই স্থান পরিত্যাগ করবে না। তাই আমাদের এখানেই অবস্থান করা উচিত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই আমীর বা দলনেতার কথায় একমত হয় নি আর গনিমতের সম্পদ জমা করার জন্য গিরিপথ থেকে নীচে নেমে আসেন– অধিকাংশ ঐতিহাসিক এটিই লিখেছেন। আর হাদীস এবং তফসীর গ্রন্থাবলিতেও সাধারণত এই বর্ণনাই পাওয়া যায় যে, এই সাহাবীরা গনিমতের সম্পদ লাভের তাড়ার

কারণে গিরিপথ পরিত্যাগ করে চলে যান। আর সূরা আলে ইমরান-এর ১৫৩ নাম্বার আয়াতে যে বর্ণিত হয়েছে, مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে এমনও আছে যারা জগতের বাসনা রাখত। আর তোমাদের মাঝে এমনও ছিল যারা পরকাল পাওয়ার বাসনা রাখত– এর তফসীর বা ব্যাখ্যায় অধিকাংশ তফসীরকারীও এটিই লিখেছেন যে, সাহাবীরা গনিমতের সম্পদ লাভের জন্য দ্রুত যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সাহাবীদের সম্পর্কে এই জাগতিক বাসনার জন্য গিরিপথ পরিত্যাগের কথা গ্রহণ করা যায় না। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও একটি অপ্রকাশিত ব্যাখ্যামূলক নোট লিখেছিলেন যা ছাপা হয় নি। সেটি আমি পরবর্তীতে বর্ণনা করব, এর ব্যাখ্যায়। তার পূর্বে কিছু কথা বর্ণনা করছি। প্রথমে পুরো আয়াতটি বর্ণনা করছি। পুরো আয়াতটি হলো-

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (সূরা আলে-ইমরান: ১৫৩)

আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সাথে কৃত নিজ অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছেন। যখন তোমরা তাঁর নির্দেশে তাদের মূলোৎপাটন করছিলে। যতক্ষণ না তোমরা ভীরুতা প্রদর্শন করলে আর তোমরা প্রকৃত নির্দেশ সম্পর্কে পরস্পরের সাথে ঝগড়া করছিলে। আর তোমরা যা পছন্দ করতে তিনি তোমাদের সেসব পর্যন্ত দেখিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তোমরা অমান্য করলে। তোমাদের মাঝে এমন লোকও ছিল যারা জগতের বাসনা রাখত। আর তোমাদের মাঝে এমনও ছিল যারা পরকালের বাসনা রাখত। এরপর তিনি তোমাদের তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন। আর যা-ই হয়েছে, তিনি নিশ্চিতরূপে তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন)। আর আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদের প্রতি অনেক অনুগ্রহশীল।

এটি হলো সেই আয়াত যার তফসীর বা ব্যাখ্যায় এই ধারণা করা হয় যে, গনিমতের সম্পদের জন্য তারা স্থান ছেড়েছেন অথবা যুদ্ধের প্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সাহাবীদের সম্পর্কে একথা বলা যে, তারা মালে গনিমতের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন এমন কথা চিন্তা করাও তাদের মর্যাদার পরিপন্থি। তারা তো স্বীয় স্ত্রী, সন্তান, এমনকি নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত তাদের সবচেয়ে প্রিয় খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর চরণে লুটিয়ে দিয়েছিলেন। এর পূর্বে তারা নিজেদের ধনসম্পদ ও মালামালও এই পথেই বিলিয়ে দিয়েছিলেন। শাহাদাতের বাসনায়, যেমনটি পূর্বে ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে, তারা বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এসব যুদ্ধ গনিমতের সম্পদ লাভের জন্য করা হচ্ছিল না, এটিতো মুসলমানদের ওপর অপবাদ। হ্যাঁ, বিজয়ের ক্ষেত্রে গনিমতের সম্পদ লাভ করা একটি বর্ধিত বিষয় হতে পারে, কিন্তু গনিমতের সম্পদ অর্জন করা সাহাবীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোটেই হতে পারত না। যাহোক, ইসলামের ইতিহাসে ও মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক, জীবনীকার অথবা হাদীস বর্ণনাকারী কিংবা তফসীরকারী বুযুর্গগণের মনে হয় কোথাও ভুল হয়েছে। কেবল কোনো রেওয়ায়েতের সনদ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে তারা নিজেদের সরলতায় অথবা এ ভেবে যে, এই রেওয়ায়েত সঠিক হবে– এমন কথা বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবীরা গনিমতের সম্পদের জন্য নীচে নেমে এসেছিলেন! তারা এই বিষয়টি অনুধাবন করেন নি যে, পরিণতি ও প্রভাবের নিরিখে এই বিষয়টি কত বেশি ক্ষতিকর প্রমাণিত

হতে পারে। আর সেই বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর কল্যাণমণ্ডিত সত্তা হোক অথবা তাঁর পবিত্রকরণ শক্তিতে কল্যাণলাভকারী সাহাবীগণ (রা.) হোক, কতটা তাদের মর্যাদাবিরোধী হতে পারে! যাহোক, সাহাবীদের আত্মত্যাগ এবং শাহাদাতের প্রেরণা দৃষ্টে একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, সাহাবীরা কেবল গনিমতের সম্পদ লাভের জন্য সেই গিরিপথ ছেড়ে আসতে তাড়াহুড়া করেছিলেন। খুব সম্ভব, এই সাহাবীরা যখন দেখেন যে, মুসলমানরা এখন বিজয়ীর আসনে আর তারা শত্রুদের তাড়াচ্ছে এবং তাদের পিছু ধাওয়া করছে, তখন গিরিপথে উপস্থিত সাহাবীরা এই স্পষ্ট বিজয়ের আনন্দে অংশীদার হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। আর বিজয়ে পর্যবসিত হওয়া এই যুদ্ধের শেষ ক্ষণে যোগ দেয়ার বাসনায় অস্থির হয়ে উঠছিলেন যে, আমরাও এই আনন্দে অংশীদার হতে চাই। তারা হয়ত ভাবছিলেন যে, আমাদের অন্য ভাইয়েরা তো জিহাদে সরাসরি অংশগ্রহণ করছে আর আমরা এখানে গিরিপথে দাঁড়িয়ে আছি। তাই জিহাদে অংশ নেয়ার বাসনায় তারা ছিলেন উদ্বেলিত যে, এখন বিজয় তো হয়ে গেছে। অতএব আজকের দিনে যে জিহাদের যবনিকাপাত ঘটতে যাচ্ছে কার্যত তাতে কিছুটা হলেও অংশগ্রহণ করি। অর্থাৎ অন্ততপক্ষে এই বিজয়ের আনন্দ তো উদযাপন করে নেই। কিন্তু তাদের দলনেতা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের, যিনি অধিক বিচক্ষণ প্রমাণিত হন, তার দৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশের প্রতি ছিল যে, যা-ই হোক না কেন– এখান থেকে নড়বে না। এটি ছিল তার সিদ্ধান্ত আর এটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল যে, যা-ই হোক আমাদের এখান থেকে সরা উচিত হবে না। যেমনটি আমি বলেছিলাম, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র অপ্রকাশিত নোটে এই আয়াতের কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এর সাথে তিনি লিখেছেন যে, مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا এখানে দুনিয়া বলতে গনিমতের সম্পদ নয়, বরং জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় বুঝায় আর আখিরাতের অর্থ হলো ফলাফল এবং শেষ পরিণতি। একথা মনে করা যে, তারা ভাবছিলেন আমরা গনিমতের সম্পদ পাব না– এটি বাস্তবতা পরিপন্থি। কেননা বদরের যুদ্ধের সময় তো তারাও গনিমতের সম্পদে অংশ লাভ করেছিল যারা কিছু অপারগতার কারণে যুদ্ধে অংশ নিতে পারে নি। তাই এই ধারণা পুরোপুরি ভুল। সাহাবীদের প্রতি জাগতিকতার (অপবাদ) আরোপ করা সঠিক নয়। একথা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন। প্রকৃত কথা হলো, তাদের এই বাসনা ছিল যে, আমরাও এই উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। এটিও জাগতিক ধারণা ছিল যে, আমরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব এবং কাফেরদের হত্যা করব। মালে গনিমত একত্রিত করার কথা এখানে বলা হয় নি। তোমাদের এই ধারণা ছিল যে, আমরা কোথাও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের থেকে পিছিয়ে না থাকি! কিন্তু এটিও এক জাগতিক ধারণা। জাগতিক ভাবনা বলার কারণ হলো, কেননা কেবল যুদ্ধ করা তো কোনো বড় বিষয় নয়। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পালন না করা– এটি জাগতিকতা বৈকি। তোমাদের তো নির্দেশ পালন করা উচিত ছিল আর তা-ই যথেষ্ট। কেননা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পালন না করা– তা ধর্মের খাতিরে যুদ্ধ হলেও এবং যেটি থেকে তিনি (সা.) বারণ করে অন্য কোথাও দায়িত্ব প্রদান করেছেন, তাই সেই নির্দেশ পালন করা হলো মূল ধর্ম, যুদ্ধ করা নয়। অতঃপর তিনি বলেন, وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ। এখানে (আল্লাহ্ তা'লা) বলেন, তোমাদের দলনেতা ও তার সঙ্গীরা তো পরকালের আকাঙ্ক্ষী ছিল। তাদের দৃষ্টিপটে ছিল শেষ পরিণতি ও ফলাফল। তারা মনে করতেন, এর ফলাফল ভালো হবে না। তিনি নির্দেশ অমান্য করার অশুভ ফলাফল দেখতে পাচ্ছিলেন।

একইভাবে তার সঙ্গীরাও তার মত সঠিক বলে মনে করছিলেন। দলনেতা ও তার সাথে সহমত পোষণকারী সঙ্গীদের দৃষ্টি এই বিষয়টির শেষ ফলাফলের প্রতি ছিল যে, তারা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। (এখানে) বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু এর বিপরীতে তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বাহ্যিকতার ওপর। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এই অর্থ সাহাবীদের সেই মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রাখে যা তাদের কাজ এবং তাদের কুরবানী থেকে প্রকাশ পায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র উক্ত নোটের উল্লেখ করে এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তারা জাগতিক কামনাবাসনা রাখত অর্থাৎ তার সাথে মতভেদকারীদের কথা বলা হচ্ছে। অপরদিকে দলের নেতা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের পরজগৎ চাইতেন। খলীফা রাবে (রাহে.) বলেন, এই বিষয়টিকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজ নোটে বর্ণনা করেছেন আর বেশ ভালো একটি দিক তুলে ধরেছেন যে, এখানে মানুষের লুটপাট ও গনিমতের সম্পদ একত্রিত করার অর্থ করা সঠিক নয়। তাদের দৃষ্টি সাময়িক বিজয়ের প্রতি ছিল। আর এখানে দুনিয়া বলতে যা বুঝায় তা হলো, যে বিষয়টি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে তাদের দৃষ্টি সেটির প্রতি ছিল, অর্থাৎ যুদ্ধে যে বিজয় লাভ হয়েছিল (সেটির প্রতি)। আর আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)'র দৃষ্টি ছিল পরকালের প্রতি। তিনি হযরত রসূলে আকরাম (সা.)-এর সন্তুষ্টিতে সবচেয়ে বড় সফলতা নিহিত বলে মনে করতেন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং আল্লাহ্ তা'লা যদি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে সাময়িকভাবে যেসব জিনিস দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সেগুলো সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং তুচ্ছ এছিল তাদের পরম চাওয়া। আমাদের প্রকৃত পুণ্য হলো তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করা। খলীফা রাবে (রাহে.) এরপর বর্ণনা করেন যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তারা জগতের বাসনা করছিলো আর অন্যরা পরকালের আকাঙ্ক্ষা করছিল মর্মে বিতর্কই অযথা। কেননা বাস্তবে সেই 'দুনিয়া' ছিলই বা কতটুকু? এটি খুবই অদ্ভুত কথা বলে মনে হয়। এরপর তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যে, যারা গিরিপথের সুরক্ষায় মোতায়েন ছিল তারা যখন গিরিপথ ছেড়ে দিয়েছে তখন পর্যন্ত তো সবকিছু ভাগবাটোয়ারাও হয়ে গিয়ে থাকবে। আর (বাকি রইল) এই ধারণা যে, তাদের সেখানে গিয়ে তাতে যোগ দেয়ার তাড়া ছিল! এরা কেন চিন্তা করে না, যেমনটি পবিত্র কুরআন বলে যে, নিজেদের লোকদের প্রতি সুধারণা পোষণ করো যে, তারা হয়ত এই ধারণার বশবর্তী হয়ে গিয়েছিল যে, সবাই বিজয় উদযাপন করছে, আনন্দ করছে, মহানবী (সা.)-এর নিকটে দাঁড়িয়ে আছে, পরস্পরকে মোবারকবাদ দিচ্ছে; তাহলে আমরা কেন এই আনন্দ উল্লাস থেকে পেছনে থাকব? অনেক সময় এমনটি হয়ে থাকে আর এটি একেবারে (মানুষের) প্রকৃতি-সম্মত। অর্থাৎ, যেখানে উৎসব পালন করা হয়, আনন্দ উদযাপন করা হয়– সবাই সেখানে ছুটে যায়। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, এখানেও (লন্ডনে) বসবাসের সময় অনেক বার দেখেছি যে, কোনো ভালো সংবাদ এলে লোকজন সমবেত হয় আর আনন্দে অংশীদার হওয়ার জন্য আসে। এখানে তো তারা কোনো মালে গনিমত নেওয়ার জন্য আসে না। তাই তারা হয়ত ভাবলেন যে, নীচে এতটা আনন্দ উদযাপন হচ্ছে, যেখানে মহানবী (সা.) ছিলেন। সবাই মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে সমবেত হয়ে আনন্দ উপভোগ করছে। খোদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে (অথচ) আমরা এখানে একাকী দাঁড়িয়ে আছি; (তাই) আমরাও সেখানে যাই। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)'র দৃষ্টি ছিল আখিরাতের ওপর। অর্থাৎ এ সময়ের আনন্দের চেয়ে এটি অনেক বেশি আনন্দের বিষয় হবে যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর খাতিরে একদিকে পৃথক বসে থাকি। আমাদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে আমরা যেন তা পালন করি। আর এর যে আনন্দ তা মূলত সেই আনন্দ নয় যা সেখানকার খুশিতে রয়েছে।

যাহোক, একদিকে যখন কাফের সৈন্যরা চরমভাবে পরাস্ত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাচ্ছিল অপরদিকে পাহাড়ের গিরিপথে মোতায়েন পঞ্চাশজনের মধ্য হতে প্রায় চল্লিশজন মুজাহিদ গিরিপথ (অরক্ষিত) রেখে নীচে নেমে আসে তখনই খালিদ বিন ওয়ালীদ (তিনি তখনও ঈমান আনেন নি) দেখেন যে, সেই পাহাড়ি গিরিপথ যেখানে তিরন্দাজদের দল মোতায়েন ছিল খালি হয়ে গেছে, মাত্র কয়েকজন পাহারাদার অবশিষ্ট আছে। এটি দেখামাত্রই সে ইকরামা বিন আবু জাহলকে সাথে নিয়ে নিজের অশ্বারোহী দলসহ ফিরে আসে। তারা পাহাড়ে চড়ে তিরন্দাজ দল থেকে যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সেই গুটিকতক লোকের ওপর হামলা করে। তাদের এই আক্রমণ এতটাই জোরালো ছিল যে, একই আক্রমণে তারা এই দলের নেতা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.) এবং তার কয়েকজন সঙ্গীকে হত্যা করে। তারা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)'র লাশের অঙ্গচ্ছেদ করে; অর্থাৎ হাত-পা এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ কেটে ফেলে। এরপর কুরাইশের এই দলটি নীচে নেমে অতর্কিতে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। মুসলমানরা তখন অসতর্কাবস্থায় গনিমতের মাল একত্র করা এবং মুশরিকদের বন্দি করার কাজে ব্যস্ত ছিল। এরই মধ্যে আচমকা মুশরিকদের অশ্বারোহী দল ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়। (তখন) এরা উয্যা এবং হুবল এর জয়ধ্বনি দিচ্ছিল, যা উহুদের দিন মুশরিকদের নারাধ্বনি ছিল। তারা মুসলমানদের অসতর্ক অবস্থায় তাদের ওপর তরবারির আঘাত হানে। মুসলমানরা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে থাকে। মালে গনিমত হিসেবে তারা যা কিছু একত্র করেছিল এবং যতজনকে বন্দি বানিয়েছিল তাদেরকে ফেলে মুসলমানরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়। না তাদের কাতার ঠিক থাকে আর না শৃঙ্খলা বাকি থাকে। তারা একে অন্যের সম্পর্কে ছিল উদাসীন। মুশরিকদের পতাকা তখনও মাটিতেই পড়ে ছিল। এই পরিবর্তিত অবস্থা দেখে হঠাৎ একজন মহিলা আমরা বিনতে আলকামা সেটি তুলে উচ্চকিত করে আর মুশরিকদেরকে উচ্চৈঃস্বরে ফিরে আসার জন্য ডাকতে আরম্ভ করে। পলায়নরত মুশরিকরা নিজেদের পতাকা উড্ডীন দেখতে পেয়ে বুঝতে পারে যে, যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেছে এবং সবাই ফিরে এসে নিজেদের পতাকার চতুর্দিকে সমবেত হয়। একজন লেখক লিখেছেন, আমরা বিনতে আলকামা নামের একজন মহিলা রক্ত ও ধূলিমলিন কুরাইশের পতাকাটি তুলে ধরে। (আর) সে জোরে জোরে সেটি ওড়াতে থাকে এবং (যুদ্ধ) ক্ষেত্র হতে পলায়নকারীদের তিরস্কার করতে থাকে। সে মক্কার কাফেরদেরকে ফিরে আসার জন্য ডাকছিল। এভাবে পরাজিত কাফেররা উহুদ-প্রান্তরে পুনরায় সমবেত হয় আর তারা সামনে ও পেছনদিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলে। মুসলমানরা নিজেদের আশংকামুক্ত মনে করে সারি ভেঙ্গে ফেলেছিল তাই তাদের (মাঝে) তখন কোনো শৃঙ্খলা বা বিন্যাস ছিল না। সেদিন মুসলমানরা বেশ বড় সংখ্যায় শাহাদতের অমিয় সুধা পান করে। পূর্বের বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয়। একজন লেখক সে সময়ের চিত্র অংকন করতে গিয়ে লিখেছেন, তিরন্দাজদের ভুলের পর মুসলমানরা নিজেদের শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলে এবং তাদের সারিগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং তারা গনিমতের মাল নিজেদের হাত থেকে ফেলে দেয় এবং দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে পরস্পরকে হত্যা করতে আরম্ভ করে আর তাদের মধ্য থেকে অনেকেই দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। তারা জানতো না যে, তারা কোথায় যাবে; বিশেষ করে মুশরিকদের ঘোষকের (এই) ঘোষণার পর যে, মুহাম্মদ (সা.) নিহত হয়েছেন। এটি এক চরম পরীক্ষা ছিল যাতে অনেক মুসলমান নিজেদের ভাইদের হাতে

অজান্তে শহীদ হয়ে ভূপাতিত হন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমানরা ভুলবশত মুসলমানদেরও হত্যা করে। আর আশংকা ছিল যে, শত্রুদের বিশাল সংখ্যা যারা খালিদ বিন ওয়ালীদের পাল্টা আক্রমণের পর পুনরায় নিজেদেরকে সুশৃঙ্খল করে নিয়েছিল, তারা স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদের ধ্বংস করে দিবে এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। যাহোক, এরপর আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন তাই শত্রুরা যা চাচ্ছিল তা হয় নি।

হযরত হুযায়ফা (রা.)'র পিতা ইয়ামান এর ভুলক্রমে মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়া সম্পর্কে লেখা হয়েছে, সাহাবীদের পরস্পরকে হত্যা করার একটি উদাহরণ হলো, হযরত হুযায়ফা (রা.)'র পিতা ইয়ামান এর, যাকে মুসলমানরা অজান্তে শহীদ করেছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, মহানবী (সা.) যখন উহুদের যুদ্ধের জন্য যান তখন সাবেত বিন ওয়াখশ এবং হুসায়েল বিন জাবের, যার নাম ছিল ইয়ামান আর তিনি হুযায়ফা বিন ইয়ামানের পিতা ছিলেন, উভয়ে বয়োবৃদ্ধ ছিলেন; তারা সেই দুর্গে ছিলেন যাতে মুসলমানদের নারী ও শিশুরা নিরাপত্তার জন্য আশ্রিত ছিল। তাদের (বৃদ্ধদের) মধ্য হতে একজন অপরজনকে বলেন, তুমি কিসের অপেক্ষা করছ? অর্থাৎ তারা উভয়েই দুর্গে আবদ্ধ অবস্থায় বসে ছিলেন। কথাবার্তা বলছিলেন যে, আমরা কিসের অপেক্ষা করছি? আমাদের জীবনে দিনতো আর বেশি বাকি নেই, আমরা বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আজ নয়তো কাল আমরা মরবই। আমরা নিজেদের তরবারি (হাতে) তুলে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হলে কেমন হয়? হয়ত আল্লাহ্ আমাদের ভাগ্যে শাহাদাত লিখে দিবেন। এরপর তারা উভয়ে তরবারি নিয়ে কাফেরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং লোকজনের সাথে মিশে যায়। অর্থাৎ, মুসলমানরা তো জানত যে, এই উভয় প্রবীণ যুদ্ধে যোগদানই করেন নি বরং মদীনায় অবস্থান করছেন। অথচ তারা রণক্ষেত্রে পৌঁছে যুদ্ধ করছিলেন, কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে তৎক্ষণাৎ শনাক্ত করতে বা চিনতে পারেন নি। জানাই যায় নি যে, এরা কারা? সাবেত বিন ওয়াখশকে কাফেররা শহীদ করে আর হুযায়ফার পিতাকে মুসলমানরা অজান্তে শহীদ করেন। শহীদ হয়ে যাওয়ার পর হুযায়ফা তাকে দেখে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! ইনি তো আমার পিতা! মুসলমানরা বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তাকে চিনতে পারি নি, ভুলক্রমে শহীদ হয়ে গেছেন! আর বাস্তবেই তারা সত্য বলেছিলেন। হুযায়ফা (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন, কেননা তিনি 'আরহামুর রাহেমীন' বা সর্বোত্তম দয়ালু। মহানবী (সা.) পরবর্তীতে হুযায়ফা (রা.)-কে তার পিতার রক্তপণ দিতে চেয়েছেন। ভুলক্রমে মুসলমানদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন তাই মহানবী (সা.) বলেন, তার রক্তপণ পরিশোধ করা হোক। কিন্তু হুযায়ফা (রা.) নেন নি; তিনি নিতে অস্বীকার করেন এবং মুসলমানদেরকে ক্ষমা করে দেন। এতে খোদা ও মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদের দৃষ্টিতে হুযায়ফা (রা.)'র মর্যাদা ও সম্মান অনেক বৃদ্ধি পায়।

এই যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)ও শাহাদত বরণ করেছিলেন। তাঁর ঘটনাও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, উমায়ের বিন ইসহাকের বরাতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের দিন হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে দুটি তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করছিলেন এবং বলছিলেন, আমি আসাদুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সিংহ। এটি বলতে বলতে কখনো সামনে যেতেন আবার কখনো পিছনে আসতেন। তিনি সে অবস্থায় হঠাৎ পিছলে পড়ে যান। ওয়াহশী আসওয়াদ তাকে দেখতে পান। আবু উসামা বলেন, সে তার দিকে বর্শা নিক্ষেপ করে এবং তাঁকে হত্যা করে। এ বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) যা লিখেছেন তা হলো,

হযরত হামযা (রা.) মহানবী (সা.)-এর আপন চাচা আর দুধভাই ছিলেন। অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিলেন এবং যে–দিকেই তিনি যেতেন কুরাইশদের সারি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত, কিন্তু শত্রুরাও তাঁর জন্য ওঁৎ পেতে ছিল। জুবায়ের বিন মুতয়িম, ওয়াহশী নামক নিজের এক হাবশী দাসকে মুক্ত করে দেবার শর্তে বিশেষভাবে এই বলে সাথে নিয়ে এসেছিল যে, যেভাবেই হোক হামযাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে হবে, কেননা তিনি জুবায়ের-এর চাচা তুআইমা বিন আদী-কে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। অতঃপর ওয়াহশী একস্থানে লুকিয়ে তার জন্য ওঁৎ পেতে ছিল এবং হামযা যখন কোনো ব্যক্তিকে হামলা করে সে স্থান অতিক্রম করেন, সে তাক করে তাঁর নাভির নীচে তার ছোট বর্শা নিক্ষেপ করে যা লাগতেই শরীরে এফোঁড়–ওফোঁড় হয়ে যায়। হামযা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান, তবুও সাহস করে উঠে দাঁড়ান এবং ওয়াহশীর দিকে একপা বাড়াতে চাইলেন, কিন্তু ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান ও মৃত্যু বরণ করেন। আর এভাবে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর একটি সুদৃঢ় হাত অকেজো হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন হামযার মৃত্যুর সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) ভীষণ মর্মাহত হন। রেওয়ায়েতে রয়েছে, তায়েফের যুদ্ধের পর যখন হামযার হন্তারক মহানবী (সা.)-এর সামনে আসে তখন তিনি (সা.) তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু হামযার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনার্থে বলেন, ওয়াহশী যেন আমার সামনে না আসে। তখন ওয়াহশী এই শপথ করে, আমি যে হাত দিয়ে মহানবী (সা.)-এর চাচাকে হত্যা করেছি, সেই হাত দিয়ে যতক্ষণ না ইসলামের কোনো বড় শত্রুকে হত্যা করব ততক্ষণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব না। যেহেতু মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছিল, চিন্তাভাবনার পরিবর্তন আসে। অতএব হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে সে নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিকারক মুসায়লামা কাযযাবকে হত্যা করে নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করে।

হযরত হামযা (রা.)'র লাশের অসম্মানও করা হয়েছে। রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা উহুদের যুদ্ধের দিনে সৈন্যদের সাথে আসে। সে তার পিতার প্রতিশোধ নেবার জন্য, যে কিনা বদরের যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)'র সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল– এই মানত করেছিল যে, আমি সুযোগ পেলে হামযার কলিজা চিবিয়ে খাব। এমন অবস্থার যখন উদ্ভব হয় এবং হযরত হামযার ওপর বিপদ নেমে আসে তখন মুশরিকরা হত্যাকৃত ব্যক্তিদের অঙ্গচ্ছেদ করল, তাদের মুখাবয়ব বিকৃত করল; নাক, কান প্রভৃতি অঙ্গ কেটে দিল। সে হামযার কলিজার এক টুকরা নিয়ে আসে, হিন্দা সেটিকে খাওয়ার জন্য চিবাতে থাকে। কিন্তু যখন সে সেটিকে গিলতে পারল না তখন তা ফেলে দেয়। এই সংবাদ যখন মহানবী (সা.) পান তখন তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আগুনের জন্য সর্বদা হামযার মাংস ভক্ষণ হারাম করে দিয়েছেন। মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)'র লাশের কাছে এসে যে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটান এবং তার উচ্চমর্যাদার সুসংবাদ প্রদান করেন সে সম্বন্ধে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) এমন অবস্থায় হযরত হামযা (রা.)'র লাশ দেখেন যখন তার কলিজা চিবানো হয়েছিল। ইবনে হিশাম বলেন, এ অবস্থায় মহানবী (সা.) হযরত হামযা (রা.)'র লাশের সামনে এসে দাঁড়ান এবং বলেন, হে হামযা! তোমার কারণে আমি যে কষ্ট পেয়েছি তেমন কোনো কষ্ট আমি জীবনেও পাই নি। আমি এর চেয়ে কষ্টকর কোনো দৃশ্য অদ্যাবধি দেখি নি। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, জিবরাঈল এসে আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব-কে সাত আকাশে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সিংহ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর ঘোরতর শত্রুদের মধ্যে একজন হিন্দাও ছিল। সে এতটাই ঘোর বিরোধী ছিল যে, উহুদের যুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করে এই বলে মানুষকে উসকে দিত যে, যাও! ইসলামী সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ করো। মুসলমানরা যখন একটি ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন সে বলে, যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত হামযা (রা.)'র কলিজা বের করে আমার কাছে নিয়ে আসবে, অনুরূপভাবে তার নাক, কান কেটে আমার কাছে নিয়ে আসবে, আমি তাকে পুরস্কৃত করব। অতঃপর হযরত হামযা (রা.)'র পবিত্র লাশের সাথে তদ্রুপ ব্যবহারই করা হয়েছিল। যুদ্ধের পর মহানবী (সা.) যখন তাঁর চাচার এমন অবমাননার কথা জানতে পারেন, স্বাভাবিকভাবে তিনি (সা.) খুব মর্মাহত হন আর তিনি (সা.) বলেন, শত্রুরা যেহেতু এ ধরনের নির্মম ব্যবহারের সূচনা করেছে তাই আমিও তাদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করব। তখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁর (সা.)-এর প্রতি ওহী নাযিল হয় যে, তাদের এই নির্মম ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁর (সা.) এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন নয় এবং ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত। মোটকথা ইসলামে (মরদেহ বিকৃত করা) বারণ করা হয়েছে।

এখানে হযরত হামযা (রা.)'র বোনের ঘটনাও এমর্মে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, তিনি ধৈর্য ও আনুগত্যে ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উহুদের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ শেষে একজন মহিলাকে ক্ষিপ্রগতিতে আসতে দেখা যায়। তার শহীদদের মরদেহ দেখে ফেলার উপক্রম হয়। কোনো মহিলা সেখানে আসবে আর মারাত্মকভাবে বিকৃত লাশগুলো দেখবে– এটি মহানবী (সা.) পছন্দ করেন নি। তাই তিনি (সা.) বলেন, এই মহিলাকে বাধা দাও, এই মহিলাকে বাধা দাও! হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলামে এ যে, আমার মা হযরত সাফিয়া (রা.)। এরপর আমি তার কাছে ছুটে গেলাম আর শাহাদাত বরণকারীদের মরদেহের নিকট তার পৌঁছানোর পূর্বেই আমি তার পথ আগলে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে তিনি আমার বুকে সজোরে ধাক্কা মেরে পিছনে সরিয়ে দেন। তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী মহিলা ছিলেন। তিনি বলেন, দূর হও, আমি তোমার কোনো কথা শুনব না। আমি বললাম, মহানবী (সা.) আপনাকে বাধা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আর বলেছেন, মরদেহগুলো দেখবেন না। একথা শোনামাত্রই তিনি থমকে গেলেন আর নিজের কাছে গচ্ছিত দুটি কাপড় দিয়ে বললেন, এই দুটি কাপড় আমি আমার ভাই হামযার জন্য নিয়ে এসেছি। কারণ আমি তাঁর (রা.) শাহাদাতের সংবাদে পেয়ে গিয়েছি। মোটকথা, তিনি (রা.) তাঁর ছেলের কথা শোনেন নি, তাকে এক ধাক্কায় পিছনে সরিয়ে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যখন মহানবী (সা.)-এর কথা শোনেন তৎক্ষণাৎ আনুগত্য প্রদর্শন করে থেমে যান। যেই না মহানবী (সা.)-এর নাম শুনেছেন, শত মর্মযতনা সত্ত্বেও সম্বিৎ ঠিক রাখেন এবং আনুগত্য করেন। এরপর তিনি (রা.) বলেন, আমি যাবো না, থেমে গেলাম; কিন্তু মহানবী (সা.)-কে অনুরোধ করো যে, আমি জানি, আমার ভাই শহীদ হয়েছেন আর কাফেররা তাঁর (রা.) মরদেহ বিকৃত করেছে। আমি শুধু তাঁকে (রা.) একপলক দেখতে চাই আর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কোনো প্রকার আহাজারি করব না, ধৈর্যধারণ করব। অতঃপর হযরত যুবায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে একথা নিবেদন করলে তিনি (সা.) বলেন, তাকে যেতে দাও; ঠিক আছে গিয়ে দেখুন। তিনি তার (রা.) ভাইয়ের মরদেহের পাশে গিয়ে বসে পড়লেন আর সিংহের মত বীর শহীদ ভাইকে দেখে অঝোরে চোখ থেকে অশ্রুবন্যা বইতে থাকে, কিন্তু মুখে টুঁ শব্দটুকুও করেন নি। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.)-ও তাঁর মরদেহ দেখতে গিয়ে মরদেহের পাশে বসে পড়েন এবং তাঁর চোখ থেকেও অশ্রুধারা

বইতে থাকে। বীর, ধৈর্যশীলা বোন কিছুক্ষণ পর অশ্রুমালার মাধ্যমে সাধুবাদ জানান। এরপর উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, আমি আমার ভাইয়ের জন্য দুটি চাদর নিয়ে এসেছি, (যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে,) শাহাদতের সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলাম বিধায় আমি নিয়ে এসেছি। তোমরা তাকে এই কাপড় দিয়ে (জড়িয়ে) দাফন সম্পন্ন করো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন হযরত হামযা (রা.)-কে সেই কাপড় দিয়ে দুকাপড় বিশিষ্ট কাফন পরাতে যাই তখন লক্ষ্য করি, তাঁর পাশেই একজন (মদীনার) আনসার শহীদ হয়ে পড়ে আছেন। হযরত হামযা (রা.)'র (লাশের) সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তার (লাশের) সাথেও অনুরূপ আচরণই করা হয়েছে। হযরত হামযা (রা.)-কে দুটি চাদরের কাফন পরাব আর এই আনসারীর ভাগ্যে একটি কাপড়ও জুটবে না– এটি ভেবে আমাদের লজ্জা হলো। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, একটি কাপড় হযরত হামযা (রা.)-কে কাফন (হিসেবে) পরাব এবং অপর কাপড় সেই আনসার সাহাবী (রা.)-কে কাফন (হিসেবে) পরাব। অনুমান করার পর জানা যায়, তাদের উভয়ের মাঝে একজন অধিক দীর্ঘকায়। লটারি করে যার ভাগ্যে যে কাপড়টি এসেছে তাকে সেই (কাপড়ের) কাফনেই দাফন করি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, হযরত হামযা (রা.) কাফের সৈন্যদলকে বিশৃঙ্খল দেখে সেনাদলের কেন্দ্রস্থলে ঢুকে পড়েন। এমন মনে হচ্ছিল যেন মুসলমানরা জয়যুক্ত। এমতাবস্থায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.)'র সঙ্গীরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে মালে গনিমতের আশায় ব্যূহ পরিত্যাগ করে নীচে চলে আসেন। শত্রুপক্ষ গিরিপথ খালি পেয়ে অশ্বারোহীদেরকে সংঘবদ্ধ করে মুসলিম বাহিনীর পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে। ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। হযরত আমীর হামযা (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.) শাহাদত বরণ করেন। হযরত আলী (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) ও হযরত সিদ্দীক (রা.)-ও আহত হন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা, হামযা (রা.)'র (বুক চিরে) কলিজা বের করে চিবায় এবং মুসলিম শহীদের নাক ও কান কেটে সেগুলো দিয়ে হার বানিয়ে গলায় পরিধান করে। শহীদদের লাশের প্রতি এমন অসম্মানজনক আচরণ দেখে মুসলমানরা ক্রোধে ফেটে পড়ে, এমনকি স্বয়ং মহানবী (সা.) এতটা মর্মাহত ও ক্রোধান্বিত হন যে, তিনি (সা.)-ও নির্দেশ দেন, এখন থেকে তোমরা জয় লাভ করলে কাফেরদের লাশের সাথে তেমনই আচরণই করবে (যেমনটি তারা আমাদের সেনাদের সাথে করেছে)। যেমন মহানবী (সা.) তার প্রাণপ্রিয় চাচা আমীর হামযাকে দেখে বলেন, لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ مَكَانَكَ অর্থাৎ, আপনার (লাশের অসম্মানের) প্রতিশোধ হিসেবে তাদের সত্তরজনের মুসলা করব, (নাক ও কেটে দেব)। কিন্তু প্রকৃতিগত করুণা ও স্বভাবগত কোমলতা সাময়িক মানবীয় ক্রোধের ওপর প্রাধান্য লাভ করে; নিম্নোক্ত আয়াত وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ সেই প্রেরণা সঞ্চার করে। এমন অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে {মহানবী (সা.)-এর} এরূপ ধৈর্যধারণ! সুবহানাল্লাহ্! وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ প্রকৃতই সত্য (প্রমাণিত হয়েছে)। এখানে তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর রাহমাতুল্লিল আলামীন হবার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, সেদিন থেকে পূর্ববর্তী সকল জাতির মাঝে লাশের অমর্যাদা এবং মুসলাহ বা অঙ্গচ্ছেদের যে নোংরা প্রথা প্রচলিত ছিল– মুসলমানদের জন্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেবল ইসলাম ধর্মই এই গৌরবের অধিকারী হয়েছে। এ যুদ্ধে মুসলমানেরা ভীষণ ক্ষয়ক্ষতির

সম্মুখীন হয়েছে আর আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)'র সেনাদের ভুলের কারণে এই বিপদ নেমে আসে। পক্ষান্তরে অনেক বড়ো একটি লাভও হয়েছে আর তা হলো, মুনাফিকদের কপটতা এবং ইহুদীদের বিদ্বেষ ও শত্রুতা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে আর নিষ্ঠাবান মুসলমান (মুনাফিক হতে সুস্পষ্টভাবে) পৃথক হয়ে গেছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভয়ংকর শত্রুদের একজন ছিল হিন্দ। উর্দুতে তাকে হিন্দা বলা হলেও আসলে তার নাম হলো হিন্দ। সে এত ভয়াবহ বিরোধী শত্রু ছিল যে, উহুদের যুদ্ধের সময় কবিতা পাঠ করে করে সৈন্যদেরকে উসকে দিচ্ছিল যে, অগ্রসর হও এবং ইসলামী সেনাদের ওপর আক্রমণ করো। মুসলমানরা যখন একটি ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন সে বলে, যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত হামযা (রা.)'র কলিজা বের করে আমার কাছে আনতে পারবে আর একইভাবে তাঁর নাক ও কান কেটে নিয়ে আসবে আমি তাকে পুরস্কৃত করব। অতএব হযরত হামযা (রা.)'র লাশের সাথে এমন (অসম্মানজনক) আচরণই করা হয়। যুদ্ধ শেষে মহানবী (সা.) যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর চাচার (লাশের সাথে) এমন অসম্মানজনক ব্যবহার করা হয়েছে তখন স্বভাবতই তিনি (সা.) কষ্ট পেয়েছেন; যে কারণে তিনি (সা.) বলেন, শত্রু যখন এ ধরনের পাশবিক আচরণের সূচনা করেই দিয়েছে তাই আমিও তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করব। তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, তাদের এরূপ অন্যায় আচরণ সত্ত্বেও তোমার এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত হবে না, বরং ক্ষমা ও মার্জনামূলক আচরণ (দ্বারা কার্যসিদ্ধি) করা উচিত হবে।

যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

আপনারা জানেন, আমি ফিলিস্তিনীদের দোয়ার আহ্বান জানিয়ে থাকি; দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যিকার পদক্ষেপ নেয়ার তৌফিক দান করুন। যদিও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ কিছুটা সোচ্চার হতে দেখা যাচ্ছে এবং বলছেও যে, অন্যায় হচ্ছে। কিন্তু মনে হয়, ইসরাঈলী সরকারের ভয়ে সবাই ভীত নতুবা পশ্চিমা বিশ্ব বৈশিষ্ট্যগতভাবেই মুসলিম বিরোধী। তাদের হৃদয়ে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যে ঘৃণা-বিদ্বেষ রয়েছে সেটির কারণে তারা চায়, মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চলমান থাকুক বা (অত্যাচার বন্ধে) যতটা প্রচেষ্টা করা দরকার ততটা না করা হোক। এরা দেখে না যে, নিরপরাধ নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর যুলুম-নির্যাতন করা হচ্ছে। যাহোক, তাদের ওপর আমরা বেশি আস্থা রাখতেও পারি না; কিন্তু চেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক, তাদেরকে বুঝাতে থাকা উচিত, পাশাপাশি দোয়াও করতে থাকা আবশ্যক। মুসলিম দেশগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা সাহস দিন, তারা যেন নিজেদের আওয়াজ উচ্চকিত করতে পারে আর প্রকৃতপক্ষে এক হয়ে এই যুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ উত্তোলন করতে পারে এবং এর নিরসনের চেষ্টা করে।

নামাযের পর আমি দুজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা মোকাররম শেখ আহমদ হুসাইন আবু সারদানা সাহেবের। তিনি গাজায় বসবাস করতেন। মুহাম্মদ শরীফ ওদে সাহেব তাঁর বিষয়ে লিখেছেন যে, সম্প্রতি গাজায় ইসরায়েলী বোমা হামলায় আমাদের এই বুযুর্গ আহমদী শেখ আহমদ হুসাইন আবু সারদানা সাহেব শহীদ হয়েছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম চলমান এ যুদ্ধে গাজার প্রথম শহীদ আহমদী। শেখ আহমদ আবু সারদানা সাহেবের বয়স হয়েছিল প্রায় ৯৪ বছর। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিধারী একজন আলেম ব্যক্তিত্ব। ১৯৭০ সালে তিনি নিজের কয়েকজন বন্ধুসহ হাইফাতে আসেন।

সেই দিনটি যেহেতু ঈদের দিন ছিল, ঐশী পরিকল্পনার অধীনে মরহুম ঈদের নামায আদায়ের জন্য নিজ বন্ধুদের সাথে কাবাবীর গিয়ে উপনীত হন। মরহুম মোবাল্লেগ সিলসিলাহ্ মওলানা বশীরুদ্দীন উবায়দুল্লাহ্ সাহেব ঈদের খুতবায় ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করেন যার ফলে মরহুম শেখ আবু সারদানা সাহেবের আগ্রহ বেড়ে যায়। তিনি পাশে বসা আহমদী ফালাউদ্দীন ওদে সাহেবকে বলেন, মওলানা বশীরুদ্দীন উবায়দুল্লাহ সাহেবের সাথে আমার বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিন। আলোচনাকালে তিনি মওলানা সাহেবকে বলেন, আমাকে আমার প্রয়াত পিতা উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি যদি নিজ জীবনে ইমাম মাহদীর আগমনের সুসংবাদ পাও তাহলে অবশ্যই বয়আত করবে'। অতএব সেদিনই মোকাররম শেখ আহমদ আবু সারদানা সাহেব বয়আত গ্রহণ করেন। তাঁকে বয়আত করতে দেখে তাঁর কোনো কোনো সাথিও বয়আত গ্রহণ করেন। মরহুম নিজ এলাকায় একজন সম্মানিত আলেম হিসেবে সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি নেই তবে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মাঝে কয়েকজন নিষ্ঠাবান আহমদী রয়েছেন। বয়আতের পর মরহুম যখনই সম্ভব হয়েছে কাবাবীরেও আসা-যাওয়া করেছেন এবং কাবাবিরের আহমদীদের সাথে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা রাখতেন আর বেশ কয়েকবার তিনি একথা প্রকাশও করেছেন যে, তিনি সত্যিকার আহমদী। পবিত্র কুরআনের সাথে অসাধারণ ভালোবাসা ছিল। তিনি সচরাচর প্রতি এক সপ্তাহে একবার সম্পূর্ণ কুরআন পড়ে শেষ করতেন। তিনি আমাকে রেকর্ড করে বাণী প্রেরণ করেছিলেন, সেখানেও এর উল্লেখ রয়েছে। ফিলিস্তিনের সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হুসাইন সারদানা মরহুম আহমদ আবু সারদানা সাহেবের ভাই ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীও উক্ত দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেও সুস্থ করে দিন।

ডা. আযীয হাফীয সাহেব এখান থেকে হিউমিনিটি ফার্স্ট-এর কাজে সেখানে যাওয়া-আসা করতেন। তার সাথে ডা. সাহেবের সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। তিনি বলেন, আমি যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই তখন তিনি আমার সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। আমি বলি, আপনি বসুন। একথা শুনে তিনি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে নিজের লাঠি দ্বারা আমাকে সামান্য স্পর্শ করে বলেন, তুমি যুগ-খলীফার প্রতিনিধি হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো, আমি কীভাবে বসে থাকতে পারি? খিলাফতের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ ছিল। এরপর তিনি আমার হাত ধরেন এবং বলেন, যেই পবিত্র ভূমির সাথে তোমার সম্পর্ক সেখানে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন হয়েছে। আর মসীহ্ মওউদ ও খিলাফতের প্রতি তাঁর এত অগাধ ভালোবাসা ছিল যা দেখে আমিও অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ি। এরপর তিনি ডাক্তার সাহেবের মাধ্যমে ফোনে আমার বরাবর একটি বাণী প্রেরণ করেন। (ডা. সাহেবকে বলেন,) আমি একটি বাণী রেকর্ড করাতে চাই। সেই বাণীটি ভাইরালও হয়েছে। আমি সেই বাণীর একটি অংশ এখানে শুনিয়ে দিচ্ছি। তিনি আমার উদ্দেশ্যে যে বাণী প্রেরণ করেন তাতে তিনি বলেন, **"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। আস্সালামু আলাইকুম, হে খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত একবার পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণটা পাঠ করি এবং প্রত্যেক ফজরে আমি আপনার জন্য দোয়া করি। হে আমার খলীফা! আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে রক্ষা করুন। আমি ভয়াবহ আধ্যাত্মিক বিপদ এবং দুশ্চিন্তার মাঝে নিপতিত।** (এরপর বলেন,) **সত্য ছাড়া জগতের আর কী চাই?** (এরপর বলেন,) **আপনার প্রতিটি আদেশ আমি মান্য করি।** (এরপর বলেন,) **আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা এখানে বেশ কষ্টসাধ্য, কিন্তু আমি**

এর জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমি ১৯৪৮ এর যুদ্ধে ৪৮ বছর বয়সে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি তিনটি সীমান্তবর্তী যুদ্ধে কমান্ডার হিসেবে সেবাদান করেছি এবং সীনায় আমি গৃহহীন হয়ে পড়েছিলাম। আমার পিতা একজন বিখ্যাত সূফি ছিলেন। আমার ভাই মুহাম্মদ এখানে গাজার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। আমার বংশে এমন সদস্যও আছে যারা আমাকে হয়রানি করে। তাদের হেদায়াত এবং সংশোধনের জন্য দোয়া করুন। এই জেলায় আমার সাথে কেবল কতিপয় বন্ধু রয়েছে। কয়েকজনের নামও তিনি উল্লেখ করেন। এরপর বলেন, **তারা আমার সন্তানের মতো প্রিয়। তাদের মাঝে একজন হলেন তারেক আবু দাইয়্যাহ সাহেব। আমার নিজের কোনো সন্তান নেই।** (এরপর আমার জন্য দোয়া করে বলেন,) **আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে কল্যাণমণ্ডিত করুন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আর আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'লার সাথে যখন সাক্ষাৎ করব, আমি আপনার হাতে একজন বয়আতকারী হিসেবে উত্থিত হব; আমার বয়আত গ্রহণ করুন।** (অর্থ্যাৎ আমি আমার বয়আত নবায়ন করছি এবং আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি সত্যিকার অর্থে মন থেকে একজন আহমদী। এরপর বলেন,) **আহমদীয়াতের বিশ্বাস ছাড়া আমার আর অন্য কোনো বিশ্বাস নেই।"** কতক বিরুদ্ধবাদী বলেছিল যে, তিনি আহমদী নন; এমনি এমনিই তাঁকে আহমদী বলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাঁর রেকর্ডকৃত বাণী এখন সম্মুখে আছে। এখন হয়তো বিরোধীদের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর সহধর্মিণীকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনীদের পক্ষে তাঁর দোয়া কবুল করুন এবং সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন আর সেসব লোককে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার সৌভাগ্য দিন।

দ্বিতীয় জানাযা কেনিয়া নিবাসী জনাব উসমান আহমদ গাকোরিয়া সাহেবের। সম্প্রতি তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাঁর জামা'তের সেবাদানের বিবরণ অনেক দীর্ঘ, অর্থাৎ বহু দশক জুড়ে রয়েছে। ১৯৩২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬০-এর দশকে তিনি আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে জানতে পারেন।

একজন পুরানো বুযুর্গ আরব আহমদী মরহুম সালেম আফির সাহেবের মাধ্যমে তিনি জামা'তের সাথে পরিচিত হন। এরপর তিনি মোবাল্লেগ সিলসিলাহ মোকাররম মওলানা রওশন দ্বীন সাহেবের মাধ্যমে ১৯৬৪ সালে বয়আত গ্রহণ করেন এবং জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন আর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বয়আতের এই অঙ্গীকার অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তিনি শিক্ষা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কেনিয়া স্বাধীন হওয়ার পর কাওয়ালেপান পলিটেকনিক স্কুলের প্রথম স্থানীয় প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। একইভাবে আরেকটি পলিটেকনিকেল কলেজেও প্রথম স্থানীয় প্রিন্সিপাল হওয়ার মর্যাদা তিনি লাভ করেন যে-বিষয়ে তিনি বিভিন্ন সময় উল্লেখ করতেন। শিক্ষা বিভাগে উচ্চতর কর্মকর্তা হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বিভিন্ন জামা'তী বইপুস্তক সোয়াহিলী ভাষায় অনুবাদ করারও সৌভাগ্য লাভ করেন। নাইরোবি জামা'তের প্রথম স্থানীয় প্রেসিডেন্ট হবারও সৌভাগ্য হয় তার। একইভাবে কেনিয়া জামা'তের প্রথম দিকের স্থানীয় মুসীদের মাঝে তিনি পরিগণিত হন। মরহুম অনেকগুলো চমৎকার গুণাবলির অধিকারী নীতিবান মানুষ ছিলেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে কখনো অলসতা প্রদর্শন করতেন না। কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগদের প্রতি তার হৃদয়ে বিশেষ সম্মান ছিল। যদি কোনো আহমদী কোনো কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগের বিষয়ে কোনো ধরনের ভুল কথা বা অভিযোগ আকারে

কোনো কথা বলতো তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে থামিয়ে দিতেন, বরং অসন্তুষ্টি এবং কঠোর বিরক্তি প্রদর্শন করতেন আর সর্বদা এই উপদেশ দিতেন যে, দেখো! আজ তোমাকে ঈমানের রঙে রঙিন করানোর পিছনে তাদেরই অবদান রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করার তোমার যে সৌভাগ্য তোমার লাভ হয়েছে তা তাদের কারণেই হয়েছে, অন্যথায় তুমি তো অজ্ঞতার মাঝে পড়ে ছিলে। এ কারণে তোমার প্রতি এই লোকদের অনেক অনুগ্রহ রয়েছে আর তোমার বংশধরদের প্রতিও অনুগ্রহ রয়েছে। এজন্য এমন ধরনের কথা বলো না। যাহোক, এটি ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমাদের মুবাল্লেগদেরকেও আর যারা নতুন যাচ্ছেন তাদেরও উচিত, তারা যেন সেই উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যেন স্থানীয়দের জন্য তারা অনুকরণীয় আদর্শ হন। একইভাবে মরহুমের মাঝে আতিথেয়তার গুণও অনেক বেশি ছিল। তার প্রায় সব সন্তানই জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন আর কোনো না কোনোভাবে জামা'তের সেবার করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন। তার এক পুত্র আব্দুল আযীয গাকোরিয়া সাহেব বর্তমান কেনিয়ার মজলিস আনসারুল্লাহর সদর পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে কৃপা এবং ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানদেরকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)